Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের কাহিনী

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা তানজিন তংকা

রোলঃ 227022011

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের কাহিনী

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা তানজিন তংকা
রোলঃ 227022011

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের কাহিনী " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা তানজিন তংকা, আইডিঃ 227022011 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের কাহিনী " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tanzin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফারজানা তানজিন তংকা

আইডিঃ 227022011

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনে বিগত নবীগণের ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? এর জবাব আল্লাহ দিয়েছেন, وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيْ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ- 'আমরা পয়গম্বরদের এসব কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করি, যদ্বারা আমরা আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এর মধ্যে এসেছে আপনার নিকটে সত্য, উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু সমূহ বিশ্বাসীদের জন্য' (হূদ ১১/১২০)। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হ'ল, যাতে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) নবুঅতের গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্ত্তত হয়ে যান এবং তাঁর উম্মত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

আদম, নূহ, ইদরীস, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়ূব, শু'আয়েব, মূসা, হারূণ, ইউনুস, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা', যুল-কিফ্ল, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)। (ইবনু কাছীর, তাফসীর নিসা ২৬৪)

এঁদের মধ্যে ইবরাহীম-পূর্ব সকল নবী আদম ও নূহের বংশধর এবং ইবরাহীম-পরবর্তী সকল নবী ও রাসূল ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর।

মানব সৃষ্টির ইতিহাস আদম(আ.) থেকে শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে এসে থাকে। আল্লাহতালা পৃথিবীতে মানুষদের পথ নির্দেশের জন্য যুগে যুগে অনেক নবী রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন, মানুষদেরকে সহজ সরল পথের দিকে ডেকেছেন। কুরআনে সর্বোমোট ২৫ জন নবী-রাসূলদের কথা উল্লেখ হয়েছে।

তাদের পথনির্দেশের মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি।

১. আদম(আ.)

প্রথমে আল্লাহ ছিলেন, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না। এমন কোন মুহূর্ত ছিলো না, যখন তিনি ছিলেন না। কোন এক পর্যায়ে অসীম জ্ঞানের মালিক সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি সৃষ্টি করবেন। তারপর তিনি ফেরেশতা ডেকে বললেন, "আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। বলো, এই বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি?"

তারা বলল, "আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।"

তিনি বললেন, "আমি যা জানি, তোমার তা জানো না"।

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানব ও প্রথম নবী হিসেবে আল্লাহপাক আদম(আ:) কে নিজ দুহাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন। (সূরা ছোয়াদ ৩৮:৭৫)

মাটির সকল উপাদানের সার নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরি সুন্দরতম অবয়বে রুহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদম(আ:) কে সৃষ্টি করেন।

অত:পর আদম(আ:) এর পাজর থেকে হাওয়া (আ:) কে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আদম(আ:) কে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।এরপর সে সমুদয় ফেরশতা সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "তোমরা আমাকে এসবের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।

তারা বললেন আপনি মহান পবিত্র আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনিই জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।

তিনি বললেন, "হে আদম। তাদেরকে এসকল নাম বলে দাও।"

যখন সে তাদেরকে এসবের নাম বলে দিলো, তিনি বললেন- "আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত। এবং তোমরা যা ব্যক্ত করো বা গোপন করো আমি তাও জানি।"

আবু মূসা আশ'আরী (রা:) বলেন, রাসূল(সা:) বলেছেন, আল্লাহাতলা আদম(আ:) কে সমগ্র পৃথিবী থেকে সংগৃহীত এক মুঠো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। তাই মাটি অনুপাতে আদমের সন্তানদের কেউ হয় সাদা, কেউ হয় গৌঢ়বর্ণ, কেউ হয় কালো কেউ মাঝারি বর্ণের।

কতিপয় সাহাবা সূত্র বর্ণনা করেন যে, তারা বলেন: আল্লাহতালা কিছু কাদামাটি নেয়ার জন্য একে একে জিবরাঈল(আ.), মিকাঈল(আ.) কে প্রেরণ করেন। কিন্তু মাটি নিতে চাইলে যমীন বলল, তুমি আমার অঙ্গহানি করবে বা আমাতে খুঁত সৃষ্টি করবে; এ ব্যাপারে তোমার নিকট থেকে আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। সর্বশেষ মালাকুল মাউত(আ) যমীনের অনাপত্তি সত্বেও আল্লাহর আদেশক্রমে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রং এর কিছু মাটি সংগ্রহ করে মিশিয়ে নিয়ে চলে না।

আল্লাহতালা আদম (আঃ)-কে বিশেষ মর্যাদা দান করেন এবং তাকে সকল নাম শেখান, যা ফেরেশতারা জানত না (সূরা আল-বাকারা ২:৩১-৩২)। তিনি আদম (আঃ)-কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেন। এর মাধ্যমে তিনি ফেরেশতাদের বোঝান যে, তিনি যা জানেন, তা অন্য কেউ জানে না।

আল্লাহ আদম (আঃ)-কে জান্নাতে স্থান দেন এবং তাকে হাওয়া (আঃ)-কে সঙ্গিনী হিসেবে সৃষ্টি করেন (সূরা আন-নিসা ৪:১)। তিনি আদম ও হাওয়াকে জান্নাতে স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি দেন, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেন (সূরা আল-বাকারা ২:৩৫)।

ইবলিস, যে অহংকারের কারণে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আদম (আঃ)-কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায় (সূরা ছোয়াদ ৩৮:৭৩-৭৪), আদম ও হাওয়াকে প্ররোচিত করে

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ায় (সূরা ত্বো-হা ২০:১২০-১২১)। ফল খাওয়ার পর তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ পায়, এবং তারা গাছের পাতা দিয়ে তা ঢাকতে চেষ্টা করেন।
এই ঘটনার পর আল্লাহ তাদের জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন এবং বলেন, "তোমরা একে অপরের শত্রু হবে এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথিবীতেই বসবাস করবে" (সূরা আল-বাকারা ২:৩৬)।
তবে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) তাদের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। তারা বলেন, "হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৩)। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং তাদের জন্য পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ আদম (আঃ)-কে মানবজাতির প্রথম নবী হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং পৃথিবীতে সঠিক পথে চলার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, "আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যদি হিদায়াত আসে, তবে যে ব্যক্তি তা অনুসরণ করবে, তার জন্য কোনো ভয় নেই, কোনো দুঃখ নেই" (সূরা আল-বাকারা ২:৩৮-৩৯)।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

সূরা আল-বাকারা: 2:30-39
সূরা আল-আ'রাফ: 7:11-27
সূরা আল-হিজর: 15:26-42
সূরা আল-ইসরা: 17:61-65
সূরা কাহফ: 18:50
সূরা ত্বোয়া-হা: 20:115-123
সূরা ছোয়াদ: 38:71-85

২. নূহ (আঃ

আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। যার শেষদিকে ক্রমবর্ধমান মানবকুলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। তিনি সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ বয়স লাভ করেছিলেন এবং সারা জীবন পথভোলা মানুষকে পথে আনার জন্য দাওয়াতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহর গযবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।যখন তার সম্প্রদায় নাফরমানিতে অটল থাকে এবং তাদের মধ্যে শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক মানুষ ঈমান আনে, তখন নূহ (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, “হে প্রভু! আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কর” (সূরা মুমিনুন ২৩:২৬) এবং “তারা যদি চলতেই থাকে, তবে তারা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে” (সূরা নূহ ৭১:২৭)।

আল্লাহ তাআলা নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেন একটি বিশাল নৌকা তৈরি করতে। তিনি বলেন, "আমাদের তত্ত্বাবধানে এবং আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী নৌকা বানাও" (সূরা হুদ ১১:৩৭)। নৌকা বানানোর সময় তার সম্প্রদায় তাকে উপহাস করে (সূরা হুদ ১১:৩৮)।

আল্লাহর নির্দেশে যখন নৌকা প্রস্তুত হয় এবং প্রলয়ংকরী বন্যা শুরু হয়, তখন তিনি নূহ (আঃ)-কে এবং তার সঙ্গে ঈমান আনা মানুষদের এবং বিভিন্ন প্রাণীর এক জোড়া করে নৌকায় উঠতে বলেন (সূরা হুদ ১১:৪০)। আল্লাহ বলেন, "তুমি ও তোমার সঙ্গীদের নৌকায় উঠিয়ে বলো, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের জালিমদের থেকে মুক্তি দিয়েছেন'" (সূরা মুমিনুন ২৩:২৮)।

বন্যায় সমস্ত কাফের ডুবে যায়, এমনকি নূহ (আঃ)-এর নিজের পুত্রও, যিনি ঈমান আনতে অস্বীকার করে।

নূহ (আঃ) তার পুত্রকে ডাকার সময় বলেন, "হে আমার বৎস! আমাদের সঙ্গে নৌকায় ওঠো এবং কাফেরদের সঙ্গী হয়ো না" (সূরা হুদ ১১:৪২)। কিন্তু তার পুত্র উত্তরে বলে, "আমি এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানির কবল থেকে রক্ষা করবে" (সূরা হুদ ১১:৪৩)। এ সময় নূহ (আঃ) তাকে সতর্ক করেন, "আজ আল্লাহর আদেশ থেকে কেউ রক্ষা পাবে না, শুধুমাত্র যার প্রতি তিনি দয়া করেন" (সূরা হুদ ১১:৪৩)। কিন্তু তাদের মধ্যে ঢেউ এসে পুত্রটিকে গ্রাস করে এবং সে ডুবে যায়।

এরপর নূহ (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, "হে আমার রব! আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনি সর্বোত্তম বিচারক" (সূরা হুদ ১১:৪৫)। আল্লাহ তাকে জবাব দেন, "হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়; সে অন্যায় কর্মের ফল" (সূরা হুদ ১১:৪৬)।

বন্যার পরে, যখন পানি থেমে যায় এবং নৌকা একটি পাহাড়ে থেমে যায়, আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে বলেন, "হে নূহ! আমাদের পক্ষ থেকে সালাম এবং কল্যাণসহ নেমে যাও" (সূরা হুদ ১১:৪৮)।

নূহ (আঃ)-এর এই ঘটনা মানুষের জন্য একটি মহান শিক্ষা। এটি দেখায়, কীভাবে একজন নবী ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন এবং নিজের সম্প্রদায়কে বারবার সঠিক পথে ডাকার চেষ্টা করেন। এটি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা, দয়া ও কঠোর শাস্তির দিকও তুলে ধরে।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা: 2:258-259
2. সূরা আন-নিসা: 4:163
3. সূরা আল-আ'রাফ: 7:59-64
4. সূরা ইউনুস: 10:71-73
5. সূরা হুদ: 11:25-49
6. সূরা আল-মুমিনুন: 23:23-30

7. সূরা আশ-শু'আরা: 26:105-122
8. সূরা আল-আনকাবুত: 29:14-15
9. সূরা আস-সাফফাত: 37:75-82
10. সূরা আল-কামার: 54:9-15
11. সূরা আল-হাক্কাহ: 69:11-12
12. সূরা নূহ: পুরো সূরা (71:1-28)

৩. ইদরিস (আঃ)

ইদরিস (আঃ) ছিলেন আদম (আঃ)-এর সপ্তম প্রজন্ম এবং শীস (আঃ)-এর বংশধর। তিনি একজন সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ নবী ছিলেন, যাকে আল্লাহ তাআলা তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন মানুষকে সঠিক পথে ডাকার জন্য। কুরআনে আল্লাহ ইদরিস (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, "আর স্মরণ কর ইদরিসকে। তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী এবং নবী। আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি" (সূরা মারইয়াম ১৯:৫৬-৫৭)।

ইদরিস (আঃ) তার সম্প্রদায়ের মানুষদের এক আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান জানান। তিনি তাদের অন্যায়, অবিচার, এবং মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। তার জীবন ছিল পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে অটল ছিলেন এবং মানুষের জন্য সৎ কাজ ও ঈমানদার জীবনের আদর্শ স্থাপন করেন।

ইদরিস (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী। ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কলম ব্যবহার করে লিখতে শেখেন। তিনি মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৃজনশীলতার বিস্তার ঘটান। তাকে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, এবং সেলাই কাজের পথিকৃত হিসেবে ধরা হয়। তার নেতৃত্বে সমাজে একটি প্রগতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

ইদরিস (আঃ)-এর জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ছিল তার আসমানে উত্তরণ। আল্লাহ তাআলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে পৃথিবী থেকে আসমানে তুলে নেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিরাজের সময়, তিনি চতুর্থ আসমানে ইদরিস (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আমি চতুর্থ আসমানে ইদরিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি তাকে সালাম জানালাম এবং তিনি সালামের জবাব দিলেন।"

ইদরিস (আঃ)-এর জীবনের মাধ্যমে আমরা শিখি, কীভাবে সত্যবাদিতা, ধৈর্য, এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য একজন মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করতে পারে। তার জীবন মানবজাতির জন্য একটি চিরন্তন অনুপ্রেরণা এবং সৎ পথে চলার শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তার জীবনকে একটি উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন, যা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং আখিরাতের উচ্চ মর্যাদা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করে।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

সূরা মারইয়াম: 19:56-57

সূরা আল-আম্বিয়া: 21:85-86

৪. হুদ (আঃ)

হুদ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন নবী, যাকে আল্লাহ ‘আদ জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলেন। ‘আদ জাতি ছিল নূহ (আঃ)-এর জাতির পরবর্তী প্রজন্ম। তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তারা বড় বড় প্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণ করত এবং তাদের বীরত্ব ও প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে এই প্রাচুর্যের সঙ্গেই তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে পড়েছিল। তারা এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয় এবং অহংকারে মত্ত ছিল। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ হুদ (আঃ)-কে তাদের হিদায়াতের জন্য পাঠান।

হুদ (আঃ) তাদের বললেন, “হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় করবে না?” (সূরা হুদ ১১:৫০)। তিনি তাদের সতর্ক করেন যে, তাদের এই অশুভ কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহর শাস্তি আসতে পারে। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন নূহ (আঃ)-এর জাতির ধ্বংসের কথা। তিনি বলেন, “তোমরা কি এমন ভাবে আচরণ করছ, যেন তোমাদের কোনো ভয় নেই? তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ পাহাড়ের ওপর, যেন সেখানে চিরকাল বাস করবে। আর তোমরা প্রভাব বিস্তারের জন্য অত্যাচার করছ।” (সূরা আশ-শুআরা ২৬:১২৭-১২৯)

‘আদ জাতি হুদ (আঃ)-এর কথা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা তাকে অবজ্ঞা করে এবং বলে, “হে হুদ! তুমি কি আমাদের কাছে এই কথা বলার জন্য এসেছ যে, আমরা আমাদের দেবতাদের ত্যাগ করব? আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।” (সূরা হুদ ১১:৫৩)। তারা দাবি করে যে, তাদের সমৃদ্ধি এবং শক্তি তাদের নিজের কর্মফলের। তারা আরও বলে, “কে আমাদের থেকে শক্তিশালী?” (সূরা ফুসসিলাত ৪১:১৫)।

হুদ (আঃ) তাদের অহংকার ও মূর্খতার কারণে দুঃখ পান। তিনি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “আমি আমার রবের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি এবং তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি না যারা আল্লাহর অংশীদার স্থির করে। এখন তোমরা সবাই একত্র হয়ে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো এবং আমাকে কোনো অবকাশ দিও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি,যিনি অামার আর তোমাদের রব,” (সূরা হুদ ১১:৫৪-৫৬)

তাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার জন্য আল্লাহ তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাদের ওপর প্রলয়ংকরী এক বাতাস প্রেরণ করেন, যা সাত রাত ও আট দিন ধরে অব্যাহত ছিল। এই বাতাস তাদের সব কিছু ধ্বংস করে দেয় এবং ‘আদ জাতি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, “তাদের সঙ্গে যা করা হয়েছিল, তা এমন ছিল যেন তারা

কখনো বসবাস করেনি। ‘আদ জাতি অবশ্যই কুফরির কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।” (সূরা হুদ ১১:৬৮)

হুদ (আঃ) এবং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছিল, তারা এই শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। তারা আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে তার হুকুম পালন করেছিল।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-আ'রাফ: 7:65-72
2. সূরা হুদ: 11:50-60
3. সূরা আশ-শু'আরা: 26:123-140
4. সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ (ফুসসিলাত): 41:13-16
5. সূরা আল-আহক্বাফ: 46:21-26
6. সূরা আদ-যারিয়াত: 51:41-42
7. সূরা আল-হাক্কা: 69:4-8

৫. সালেহ (আঃ)

সালেহ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন নবী, যাকে আল্লাহ ছামূদ জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলেন। ছামূদ জাতি ছিল ‘আদ জাতির উত্তরসূরি এবং তারা বেশ সমৃদ্ধ, শক্তিশালী এবং উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। তারা পাহাড় কেটে দৃষ্টিনন্দন ঘর তৈরি করত এবং তাদের প্রাচুর্য ও দক্ষতা নিয়ে গর্ব করত। তবে তাদের অন্তর ছিল কঠিন, আর তারা আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল।

সালেহ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকার জন্য প্রেরিত হন। তিনি তাদের বলেন, “হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তিনিই তোমাদের পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তোমাদের স্থাপন করেছেন। কাজেই তার কাছে ক্ষমা চাও এবং তার দিকে ফিরে আসো। আমার রব কাছেই আছেন এবং তিনি দোয়া কবুল করেন।” (সূরা হুদ ১১:৬১)

ছামূদ জাতি প্রথমে সালেহ (আঃ)-কে সম্মান করত, কারণ তিনি ছিলেন তাদের মধ্যেই একজন এবং তার চরিত্র ছিল অত্যন্ত পবিত্র। তবে নবুওয়তের আহ্বান আসার পর তাদের মনোভাব বদলে যায়। তারা তার বার্তা অস্বীকার করে এবং উপহাস করে বলে, “তুমি তো আমাদের মতো একজন মানুষ। আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত, তাদের ছেড়ে আমরা কি তোমার কথা শুনব?” (সূরা আশ-শুআরা ২৬:১৫৩-১৫৪)

ছামূদ জাতি প্রমাণের জন্য সালেহ (আঃ)-এর কাছে একটি বিশেষ চিহ্ন চায়। তারা বলে, “যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের জন্য একটি বিস্ময়কর চিহ্ন নিয়ে আসো।” (সূরা আশ-শুআরা ২৬:১৫৪) সালেহ (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে তাদের জন্য একটি বিশেষ নিদর্শন উপস্থাপন করেন। আল্লাহ ছামূদ জাতির জন্য পাহাড় থেকে একটি অসাধারণ উটনী বের

করে দেন। তিনি তাদের সতর্ক করে বলেন, “এটি আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের জন্য একটি চিহ্ন। একে তার নিজের পান করার সময় অনুযায়ী পানি গ্রহণ করতে দাও এবং কোনো ক্ষতি করো না।” (সূরা হুদ ১১:৬৪)

তবে তাদের নেতারা ঈর্ষা ও অবিশ্বাসে মত্ত ছিল। তারা উটনীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে এবং একদিন উটনীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই অপরাধের পর সালেহ (আঃ) তাদের বলেন, “তোমরা তিন দিনের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ হলো এমন শাস্তি, যা তোমাদের জন্য অবধারিত।” (সূরা হুদ ১১:৬৫)

তিন দিন পর আল্লাহ তাদের ওপর ভয়ংকর শাস্তি পাঠান। এক প্রবল শব্দ এবং ভূমিকম্প তাদের জনপদকে ধ্বংস করে দেয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন, “তাদের একটি প্রচণ্ড শব্দ আঘাত করে, আর তারা নিজেদের ঘরে উল্টে পড়ে থাকে।” (সূরা হুদ ১১:৬৭)

ছামূদ জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে সালেহ (আঃ) এবং যারা ঈমান এনেছিল, তারা এই শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-আ'রাফ: 7:73-79
2. সূরা হুদ: 11:61-68
3. সূরা আশ-শু'আরা: 26:141-159
4. সূরা আন-নামল: 27:45-53
5. সূরা হা-মীম সাজদাহ: 41:17-18
6. সূরা আল-ক্বামার: 54:23-31
7. সূরা আশ-শামস: 91:11-15

৬. ইবরাহিম (আঃ)

ইবরাহিম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবী এবং ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পিতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন এক আল্লাহর প্রতি সমর্পিত, একনিষ্ঠ ঈমানদার এবং তাওহিদের (আল্লাহর একত্ববাদের) প্রচারক। তার জীবন ছিল আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস, ধৈর্য, ত্যাগ এবং আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুরআনে ইবরাহিম (আঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য একটি অনুপ্রেরণা।

ইবরাহিম (আঃ)-এর জন্ম মূর্তিপূজায় নিমগ্ন এক সমাজে। তার পিতা আযার ছিলেন একজন মূর্তি নির্মাতা। তবে ইবরাহিম (আঃ) অল্প বয়সেই উপলব্ধি করেন যে, মূর্তিপূজা একটি ভ্রান্ত পথ। তিনি তার পিতাকে এবং সমাজের মানুষদের সতর্ক করে বলেন, “হে আমার পিতা! আপনি কেন এমন জিনিস পূজা করেন, যা শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো উপকারে আসবে না?” (সূরা মারইয়াম ১৯:৪২)। তিনি তাদের আহ্বান জানান এক আল্লাহর ইবাদতের পথে আসার জন্য।

ইবরাহিম (আঃ) একবার প্রমাণ করার জন্য একটি কার্যকলাপ করেন। তিনি মন্দিরে থাকা সব মূর্তি ভেঙে ফেলেন এবং সবচেয়ে বড় মূর্তিটির গলায় কুঠার ঝুলিয়ে রাখেন। যখন লোকেরা জানতে চায়, কে এটি করেছে, তখন তিনি বলেন, "বড় মূর্তিটি করেছে। যদি এটি কথা বলতে পারে, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করো।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৩)। এটি ছিল তাদের মূর্তির অসহায়ত্ব প্রমাণের একটি দৃষ্টান্ত। তবে তাতে তারা বিশ্বাসের পরিবর্তে ক্রোধে মত্ত হয় এবং ইবরাহিম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়।

আল্লাহর প্রতি ইবরাহিম (আঃ)-এর দৃঢ় আস্থা এবং বিশ্বাস তাকে এই পরীক্ষায় সুরক্ষা দেয়। আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দেন, "হে আগুন! তুমি শীতল এবং ইবরাহিমের জন্য শান্তির উৎস হয়ে যাও।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৯)। আগুন ইবরাহিম (আঃ)-এর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, যা আল্লাহর করুণা ও তার নবীর প্রতি ভালোবাসার উদাহরণ।

ইবরাহিম (আঃ)-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল তার পুত্র ইসমাইল (আঃ)-এর কুরবানি। আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করার জন্য আদেশ দেন, যেন তিনি তার প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে কুরবানি করেন। ইবরাহিম (আঃ) এই আদেশ বিনা দ্বিধায় মান্য করেন এবং ইসমাইল (আঃ) নিজেও এই আদেশ মেনে নিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু ঠিক কুরবানির মুহূর্তে, আল্লাহ ইসমাইল (আঃ)-এর পরিবর্তে একটি পশু দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করেন। আল্লাহ বলেন, "তুমি স্বপ্নে যা দেখেছিলে, তা সত্য করে দেখালে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।" (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০৫-১০৭)। এটি ছিল আল্লাহর প্রতি ইবরাহিম (আঃ)-এর ত্যাগ ও আনুগত্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

ইবরাহিম (আঃ)-এর জীবনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো কাবা নির্মাণ। আল্লাহর নির্দেশে তিনি তার পুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় কাবাঘর নির্মাণ করেন। এটি ছিল এক আল্লাহর ইবাদতের কেন্দ্রস্থল। তারা দোয়া করেন, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-বাকারা ২:১২৭)।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা: 2:124-132, 2:258-260
2. সূরা আলে ইমরান: 3:33, 3:65-68
3. সূরা আন-নিসা: 4:54-55, 4:125
4. সূরা আল-আনআম: 6:74-84
5. সূরা আত-তওবা: 9:114
6. সূরা হুদ: 11:69-76
7. সূরা ইবরাহিম: 14:35-41
8. সূরা আল-হিজর: 15:51-56
9. সূরা আন-নাহল: 16:120-123
10. সূরা মারইয়াম: 19:41-50

11. সূরা আল-আম্বিয়া: 21:51-73
12. সূরা আল-হজ্ব: 22:26-33
13. সূরা আশ-শু'আরা: 26:69-89
14. সূরা আল-আনকাবুত: 29:16-27
15. সূরা আস-সাফফাত: 37:83-113
16. সূরা আশ-শূরা: 42:13
17. সূরা আয-যুখরুফ: 43:26-28
18. সূরা আয-যারিয়াত: 51:24-30
19. সূরা আল-মুমতাহিনা: 60:4-6

৭. লুত (আঃ)

লুত (আঃ) ছিলেন ইবরাহিম (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আল্লাহর একজন নবী। আল্লাহ তাকে পাপমগ্ন একটি জাতির কাছে প্রেরণ করেন, যারা তাদের নৈতিকতা হারিয়ে অভব্য ও কুরুচিপূর্ণ কাজের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। কুরআনে আল্লাহ লুত (আঃ)-এর নবুওয়তের মিশন, তার জাতির অবস্থা এবং তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

লুত (আঃ)-কে আল্লাহ তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান, যারা কুসংস্কার, অশ্লীলতা এবং সমকামিতায় অভ্যস্ত ছিল। তিনি তাদের আল্লাহর একত্ববাদের পথে ডাকেন এবং তাদের নৈতিক অবক্ষয় থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তিনি তাদের সতর্ক করে বলেন, "তোমরা কি সেই লজ্জাজনক কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে জগতের কেউ করেনি?" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৮০)। তিনি আরও বলেন, "তোমরা কি নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে আসো? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।" (সূরা আশ-শু'আরা ২৬:১৬৫-১৬৬)

তবে তার জাতি তার কথা শোনেনি এবং তার আহ্বানকে অস্বীকার করে উপহাস করে। তারা বলেছিল, "তাদের গ্রাম থেকে লুত এবং তার অনুসারীদের বের করে দাও, কারণ তারা খুবই পবিত্র হতে চায়।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৮২)

লুত (আঃ) তাদের অশ্লীলতা ও অবাধ্যতার জন্য তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু তার জাতি কোনোভাবেই সাড়া দেয়নি। তাদের দুষ্কর্ম যখন চরমে পৌঁছায়, তখন আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত জানান। তিনি লুত (আঃ)-কে এবং তার পরিবারকে রাতের বেলায় গ্রাম ত্যাগ করতে আদেশ দেন, কিন্তু সাবধান করে দেন, "পেছনে তাকাবে না এবং ভোর হওয়ার আগেই চলে যাও।" (সূরা হুদ ১১:৮১)

পরের দিন, আল্লাহর আদেশে তাদের পাপপূর্ণ জনপদের ওপর এক ভয়ংকর শাস্তি নেমে আসে। ফেরেশতারা তাদের শহরকে উল্টে দেন এবং তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

আল্লাহ বলেন, “আমি তার ওপর উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।” (সূরা হিজর ১৫:৭৪)
তবে লুত (আঃ)-এর স্ত্রী, যিনি বিশ্বাসী ছিলেন না এবং তার জাতির দুষ্কর্মে যোগ দিয়েছিলেন, তিনিও শাস্তি থেকে রক্ষা পাননি। আল্লাহ বলেন, “তাকে পেছনে রেখে দেয়া হলো এবং সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিল।” (সূরা হুদ ১১:৮১)

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-আ'রাফ: 7:80-84
2. সূরা হুদ: 11:69-83
3. সূরা আল-হিজর: 15:57-77
4. সূরা আন-নাহল: 16:77-78
5. সূরা আল-আম্বিয়া: 21:74-75
6. সূরা আশ-শু'আরা: 26:160-175
7. সূরা আন-নামল: 27:54-58
8. সূরা আল-আনকাবুত: 29:28-35
9. সূরা আস-সাফফাত: 37:133-138
10. সূরা আয-যারিয়াত: 51:31-37
11. সূরা আল-কামার: 54:33-39
12. সূরা আত-তাহরিম: 66:10

৮. ইসমাঈল (আঃ)

ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রিয় নবী ইবরাহিম (আঃ)-এর পুত্র এবং ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যক্তিত্ব। তার জীবন ছিল একনিষ্ঠ আনুগত্য, ত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাসের চিত্র। ইসমাঈল (আঃ)-এর মা হাজেরা (আঃ) ছিলেন ইবরাহিম (আঃ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী, যিনি আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় স্থানান্তরিত হন। ইসমাঈল(আ.) ছিলেন বিশুদ্ধ কুরাইশী আরবী ভাষার প্রথম ইলহাম প্রাপ্ত মনীষী।
ইসমাঈল(আ.) ছিলেন পিতা ইবরাহিম(আ.) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরা(আ.) এর একমাত্র গর্ভজাত সন্তান। সেসময় ইবরাহিম(আ.) এর বয়স ছিলো ৮৬ বছর। শিশু বয়সে তাকে ও তার মাকে পিতা ইবরাহিম(আ.) আল্লাহর নির্দেশে মক্কার বিজন ভূমিতে রেখে আসেন। ইবরাহিম (আঃ) তাকে এ কথা বলেন, “এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ কখনোই আমাদের ছেড়ে যান না।” (সূরা ইবরাহিম ১৪:৩৭)।
মক্কায়, যেখানে পানির কোন উৎস ছিল না, হাজেরা (আঃ) তার শিশুপুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্য পানির সন্ধানে দৌড়াতে শুরু করেন। তিনি সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দৌড়াতে থাকেন, এবং আল্লাহর অশেষ রহমত হিসেবে, একটি ঝরনা বের হয়ে আসে, যা

হাজেরা (আঃ)-এর জন্য এবং তার নবজাতক পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্য রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়। এটি ছিল পৃথিবীতে পানি সরবরাহের প্রথম উৎস। অত:পর ইয়ামেনের ব্যবসায়ী কাফেলা বনু-জুরহুম গোত্র কর্তৃক মা হাজেরার আবেদনক্রমে সেখানে আবাদী শুরু হয়। ১৪ বছর বয়সে আল্লাহর হুকুমে মক্কার অনতিদূরে মিনার প্রান্তরে সংঘঠিত হয় বিশ্ব ইতিহাসে বিশ্বস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনা।

ইসমাঈল (আঃ)-এর জীবন ছিল অবিচল আনুগত্য ও ঈমানের চিত্র। তিনি ছোট বয়স থেকেই তার পিতার মতো আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে চলতেন। যখন ইবরাহিম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে তাকে কুরবানি করার প্রস্তুতি নেন, তখন ইসমাঈল (আঃ) কোনও দ্বিধা না করে তার পিতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেখান এবং আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কুরআনে বর্ণনা রয়েছে, “তুমি যা স্বপ্নে দেখেছ, তা পালন করো। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।” (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০৭)। ইসমাঈল (আঃ) তার পিতার সঙ্গে একযোগে আল্লাহর নির্দেশ পালনে প্রস্তুত ছিলেন।

ইসমাঈল (আঃ)-এর জীবনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল কাবা নির্মাণ। ইবরাহিম (আঃ) যখন আল্লাহর নির্দেশে কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন, তখন তিনি ইসমাঈল (আঃ)-কে তার সঙ্গী হিসেবে পান। তারা দুজন মিলে একসাথে কাবাঘর নির্মাণ করেন, যা মুসলিমদের জন্য একটি পবিত্র স্থান হয়ে ওঠে। কুরআনে এই নির্মাণের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা আল-বাকারা ২:১২৭)।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা: 2:125, 2:127, 2:133
2. সূরা আলে ইমরান: 3:84
3. সূরা আন-নিসা: 4:163
4. সূরা আল-আনআম: 6:86
5. সূরা মারইয়াম: 19:54-55
6. সূরা আল-আম্বিয়া: 21:85-86
7. সূরা আস-সাফফাত: 37:101-107
8. সূরা ছোয়াদ: 38:48

৯. ইসহাক (আঃ)

ইসহাক (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবী এবং ইবরাহিম (আঃ)-এর পুত্র। তার জীবন ছিল একনিষ্ঠ ঈমান, ত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের উদাহরণ। তিনি এক আল্লাহর

ওপর বিশ্বাস রেখে তার জীবন যাপন করেছিলেন এবং তার মায়ের গর্ভে আসার আগেই আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদায় সম্মানিত করেছিলেন।
ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম ছিল আল্লাহর অশেষ রহমতের প্রতিফলন। তার মা সারাহ (আঃ) ছিলেন বয়সে বৃদ্ধ এবং সন্তান ধারণে অক্ষম। কিন্তু একদিন আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহিম (আঃ)-এর কাছে একটি সুখবর পৌঁছায়। আল্লাহ তাকে জানান যে, সারাহ (আঃ) একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেবেন। ইবরাহিম (আঃ) এই বার্তা শুনে অবাক হয়ে যান, কারণ তার বয়স ছিল অনেক বেশি এবং তার স্ত্রীর বয়সও অনেক অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ বলেন, "এটা আল্লাহর কাজ, তিনি যা চান, তা করতে পারেন।" (সূরা হুদ ১১:৭১)। এইভাবে, আল্লাহর অশেষ রহমত এবং ক্ষমতার মাধ্যমে ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম হয়। আল্লাহ বলেন, "অতঃপর তাকে একটি সরল ছেলে (ইসহাক) প্রদান করলাম।" (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১১২)।
ইসহাক (আঃ)-এর জীবন ছিল আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর এক দৃষ্টান্ত। তিনি তার পিতার মতোই আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন এবং তার পথ অনুসরণ করে সৎ কাজের আহ্বান জানাতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও পবিত্র ছিলেন, এবং তাঁর জীবনে কোনো শিরক বা অন্য কোনো ভুল ছিল না। আল্লাহ তাকে শক্তিশালী, বিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ একজন লোক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "আমরা তাকে (ইসহাক) পুরস্কৃত করেছি।" (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১১৩)।
ইসহাক (আঃ)-এর জীবনে এক বিশেষ ঘটনা ছিল তার পুত্র, ইয়াকুব (আঃ)-এর জন্ম। ইসহাক (আঃ)-এর বয়স যখন অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ তাকে ইয়াকুব (আঃ) প্রদান করেন, যিনি পরবর্তীতে আল্লাহর নবী হিসেবে নিযুক্ত হন। ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র ইয়াকুব (আঃ) ছিলেন ইসরাইল জাতির পিতামহ এবং তার পরবর্তী বংশধরেরা একে একে আল্লাহর নবী হিসেবে নির্বাচিত হন।
ইসহাক (আঃ)-এর জীবন ছিল এক মহান শিক্ষা। তিনি কখনোই আল্লাহর পথে বিচ্যুত হননি, এবং তার জীবন অনুসরণীয় হয়ে উঠেছে সবার জন্য। কুরআনে আল্লাহ তাকে "নিষ্ঠাবান, সৎ, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী" হিসেবে বর্ণনা করেছেন (সূরা মারইয়াম ১৯:৪৮)। তাঁর জীবনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের দেখান যে, একজন নবী কিভাবে তার দায়িত্ব পালন করে, কঠিন মুহূর্তেও ধৈর্য ধরে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে এবং মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রাখে।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা: 2:133, 2:136, 2:140
2. সূরা আলে ইমরান: 3:84
3. সূরা আন-নিসা: 4:163
4. সূরা আন-আম: 6:84

5. সূরা হুদ: 11:69-73
6. সূরা ইবরাহীম: 14:39
7. সূরা মারইয়াম: 19:49
8. সূরা আল-আম্বিয়া: 21:72
9. সূরা আন-কাবুত: 29:27
10. সূরা আস-সাফফাত: 37:112-113
11. সূরা ছোয়াদ: 38:45-47

১০. ইয়াকুব (আঃ)

ইয়াকুব (আঃ) ছিলেন আল্লাহর এক মহান নবী, এবং তিনি ইবরাহিম (আঃ)-এর পরিবারের একজন সদস্য। তাঁর পিতার নাম ইসহাক (আঃ) এবং দাদা ছিলেন ইবরাহিম (আঃ)।
ইয়াকুব (আঃ)-এর জীবন ছিল এক মহান আদর্শের প্রতিফলন, তিনি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কুরআনে আল্লাহ তাকে "একটি বিশেষ মহান ব্যক্তি" বলে বর্ণনা করেছেন (সূরা আল-আন'am ৬:৮৪)।
ইয়াকুব (আঃ)-এর শৈশব ছিল সুখের, কিন্তু পরবর্তীতে তার জীবন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়েছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং আল্লাহর পথে চলতে সদা প্রস্তুত। ইয়াকুব (আঃ)-এর সাতটি পুত্র ছিল, যারা পরবর্তীতে ইসরাইল জাতির গোত্রপতি হিসেবে পরিচিত হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত পুত্র ছিলেন ইউসুফ (আঃ), যাকে আল্লাহ বিশেষভাবে সম্মানিত করেছিলেন।
ইয়াকুব (আঃ) এবং তার পরিবার অনেক বছর একে অপরের কাছাকাছি বাস করছিল। একদিন ইউসুফ (আঃ) স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি এবং তার ভাইয়েরা সূর্য, চাঁদ এবং এগারো তারার সম্মুখে সিজদা করছেন (সূরা ইউসুফ ১২:৪)। ইউসুফ (আঃ) এই স্বপ্নটি তার পিতার কাছে বর্ণনা করলে, ইয়াকুব (আঃ) বুঝতে পারেন যে এটি একটি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, যেখানে আল্লাহ তার পুত্রকে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন। তবে, তিনি এটাও বুঝতে পারেন যে তার অন্যান্য ছেলেরা হয়তো ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে পারে।
ইয়াকুব (আঃ)-এর ছেলেরা একদিন ইউসুফ (আঃ)-কে একটি গভীর কূপে ফেলে দেয়, এবং তার পরনে থাকা জামাকাপড়টিও রক্তে ভরে আসে, যাতে তার পিতাকে মনে হয় যে ইউসুফ (আঃ) মারা গিয়েছে। কিন্তু ইয়াকুব (আঃ) এর অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ছিল আল্লাহর ওপর আস্থার প্রতি, এবং তিনি বলেছিলেন, "তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমি সহ্য করবো। আল্লাহ আমার সহায় হবে।" (সূরা ইউসুফ ১২:১৮)। তিনি কখনোই আল্লাহর উপর থেকে আশা হারাননি, যতই কঠিন পরিস্থিতি কেন না হোক।
একইভাবে, আল্লাহ তাকে তার পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর জন্য ফিরিয়ে দেন, যখন ইউসুফ (আঃ) মিসরে পদমর্যাদা লাভ করেন এবং সেখানে একদিন তার পরিবারের সঙ্গে পুনরায়

মিলিত হন। কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, “ইয়াকুব (আঃ) যখন তাঁর পুত্র ইউসুফকে ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তাঁর চোখের দৃষ্টি ফিরে আসে, এবং তাঁর বিশ্বাস পূর্ণ হয়।” (সূরা ইউসুফ ১২:৯৪)।

ইয়াকুব (আঃ)-এর জীবনে একটি বড় দৃষ্টান্ত ছিল তার ধৈর্য, বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা। যখন তার জীবন কঠিন হয়ে উঠেছিল, তিনি কখনোই আল্লাহর রহমত থেকে আশাহীন হননি, বরং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। তার জীবন থেকে আমরা শিখতে পারি যে, কোন পরিস্থিতিতেই আল্লাহকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়, বরং তার উপর বিশ্বাস রাখা উচিত।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা: 2:132-133, 2:136, 2:140
2. সূরা আলে ইমরান: 3:84
3. সূরা আন-নিসা: 4:163
4. সূরা আন-আম: 6:84
5. সূরা হুদ: 11:71-72
6. সূরা ইউসুফ: 12:4-101 (পুরো সূরায় ইয়াকুব (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে)
7. সূরা মারইয়াম: 19:49
8. সূরা আল-আম্বিয়া: 21:72
9. সূরা আন-কাবুত: 29:27

১১. ইউসুফ (আঃ)

ইউসুফ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর এক মহান নবী, যিনি ছিলেন ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্র এবং তাঁর জীবনের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইউসুফ (আঃ)-এর জীবন ছিল এক অনন্য পরীক্ষা, যেখানে তিনি একে একে বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ধৈর্য এবং ত্যাগের নিদর্শন স্থাপন করেছেন। তাঁর জীবন কুরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং তার জীবনের নানা ঘটনা আমাদের জন্য এক মহামূল্যবান শিক্ষা।

ইউসুফ (আঃ)-এর শৈশব ছিল খুবই সুখী। তিনি ছিলেন ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রিয় সন্তান, এবং তার প্রতি এক বিশেষ ধরনের মমতা ও ভালোবাসা ছিল। একদিন ইউসুফ (আঃ) তার পিতা ইয়াকুব (আঃ)-কে একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেন। স্বপ্নে তিনি দেখেন, সূর্য, চাঁদ এবং এগারো তারকা তাকে সিজদা করছে। ইউসুফ (আঃ) এই স্বপ্নটি তার পিতাকে বললে, ইয়াকুব (আঃ) তা শুনে বলেন, "এটা তোমার ভবিষ্যৎ এবং আল্লাহ তোমাকে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন।" (সূরা ইউসুফ ১২:৬)।

এই স্বপ্নের পর ইউসুফ (আঃ)-এর অন্যান্য ভাইয়েরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে ক্ষতি করতে চায়। তারা তাকে একটি গভীর কূপে ফেলে দেয় এবং তার জামাকাপড় রক্তে ভরে পিতার কাছে নিয়ে আসে, বলার উদ্দেশ্যে যে, "ইউসুফ (আঃ) মারা গেছে।" (সূরা ইউসুফ ১২:১৬)। তবে, ইয়াকুব (আঃ) খুবই মন খারাপ হলেও তিনি আল্লাহর উপর আস্থা হারাননি এবং বলেছিলেন, "যা কিছু ঘটেছে, তা আমি সহ্য করবো, আমি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা ইউসুফ ১২:১৮)।

ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল তার মিসরে যাওয়ার পর মিসর আযীযের স্ত্রীর কাছে শয়তানি প্রস্তাবের সম্মুখীন হওয়া। মিসরের সরকারী কর্মকর্তার স্ত্রী তাকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তার সততা বজায় রাখেন এবং আল্লাহর ভয় অনুভব করেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "এমনিই ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ করে দিয়েছিলাম, যাতে সে আমাদের সাক্ষ্য রাখে এবং সতর্ক থাকে।" (সূরা ইউসুফ ১২:২৪)। আল্লাহর সাহায্য ও তাকে দেওয়া দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে ইউসুফ (আঃ) সেই সৎ পথে ছিলেন এবং তিনি অপরাধের প্রলোভনে পড়ে না।

এ ঘটনার পর ইউসুফ (আঃ) মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে যেতে বাধ্য হন, কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি নিজের প্রজ্ঞা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অনেকের মনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হন, এবং আল্লাহ তাকে এমন যোগ্যতা প্রদান করেন যে, একদিন মিসরের রাজসভায় তাকে বিশেষ পদে স্থান দেওয়া হয়। একদিন রাজসভায় একটি স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার সুযোগ আসে, যা মিসরের রাজা দেখেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) সঠিক ব্যাখ্যা দেন এবং শস্যের সংকটের পূর্বাভাস দেন, যার ফলে তিনি রাজ্যের খাদ্য সঞ্চয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

ইউসুফ (আঃ)-এর বড় পরীক্ষা ছিল যখন তার ভাইয়েরা খাবারের জন্য মিসরে আসেন। তাদের কাছে ইউসুফ (আঃ)-এর পরিচয় গোপন ছিল, তবে তিনি তাদের চিনতে পারেন। এই সুযোগে ইউসুফ (আঃ) তাদের ক্ষমা করে দেন এবং বলে দেন, "আজ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন দোষ ধরি না, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করেছেন।" (সূরা ইউসুফ ১২:৯২)। তার এই মহান ক্ষমা এবং উদারতা দেখিয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজেকে মিত্র হিসেবে তাদের কাছে তুলে ধরেন।

শেষে ইউসুফ (আঃ) তার পিতাকে মিসরে নিয়ে আসেন এবং তাদের পুনঃমিলন ঘটে। তাদের মিলনে ইয়াকুব (আঃ) ও তার পরিবার আনন্দিত হন এবং ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনের পরীক্ষার শেষ হয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "এভাবে আমি ইউসুফ (আঃ)-কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি।" (সূরা ইউসুফ ১২:১০৩)। ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তার দাসদের জন্য এমন এক প্রমাণ রাখলেন, যা আজও আমাদের শিক্ষা দেয়—বিশ্বাস, ধৈর্য, সততা, এবং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-আনআম: 6:84
2. সূরা ইউসুফ: 12:4-101 (পুরো সূরা ইউসুফ (আ.)-এর জীবনী এবং ঘটনাবলী নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে)
3. সূরা গাফির (আল-মুমিন): 40:34

১২. শুআইব (আঃ)

শুআইব (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী, যিনি মাদিয়ান জাতির কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ এবং অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি। তাঁর জীবনের ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং তার মাধ্যমে মানুষকে ন্যায়ের পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুআইব (আঃ)-এর জাতি ছিল মাদিয়ান, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মাপঝোখে প্রতারণা করত। তারা বিক্রি-কেনা করার সময় মাপের দিকে অসততা দেখাত এবং তার মাধ্যমে মানুষকে ক্ষতি করত। আল্লাহর নির্দেশে শুআইব (আঃ) তাদের কাছে প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে সততার পথে আসতে এবং আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে আহ্বান করেন। তিনি বলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং সততার পথে ফিরে এসো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।" (সূরা হুদ ১১:৮৫)।

শুআইব (আঃ) তাদেরকে সততা, মাপঝোখের সঠিকতা এবং ব্যবসার মধ্যে ন্যায়ের কথা বলেন, কিন্তু তারা তার কথা উপেক্ষা করে। তারা সৎ ব্যবসায়িক প্রথার পরিবর্তে প্রতারণা, মাপের কমতি, এবং মন্দ কাজের দিকে ঝুঁকেছিল। শুআইব (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর অভিশাপের কথা শোনান, কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং তাকে মিথ্যা আখ্যা দেয়। তারা বলে, "হে শুআইব! তুমি কি আমাদের ধর্মের ব্যাপারে আমাদেরকে উপদেশ দিতে চাও? তুমি কি আমাদের সবার মতো মাপঝোখের পদ্ধতিতেই চলতে বলো?" (সূরা হুদ ১১:৮২)।

তাদের প্রত্যাখ্যানের পর, শুআইব (আঃ) তাদেরকে সতর্ক করে দেন এবং বলেন, "আমি তো তোমাদের কাছে আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে পাঠানো হয়েছি, আর আমি তো জানি আল্লাহ যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তবে আমার কিছুই করার নেই।" (সূরা হুদ ১১:৮৬)। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ যদি তাদের থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তাদের অশেষ ক্ষতি হবে এবং তারা ধ্বংস হবে।

এরপর, শুআইব (আঃ) এবং তার অনুসারীরা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকেন। একদিন আল্লাহ তাদেরকে একটি ভয়ঙ্কর দণ্ড দেন, যখন তারা তাঁর নবীর কথায় ফিরল না। আল্লাহ তাদেরকে একটি ভয়ানক ঝড়, বজ্রপাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে শাস্তি দেন। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, "অতঃপর তাদের ওপর এক ভয়াবহ আযাব আসে, এবং তারা সেজন্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" (সূরা আল-আরাফ ৭:৯৩)।

শুআইব (আঃ) এবং তার অনুসারীরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে বেঁচে ছিলেন, কিন্তু মাদিয়ান জাতির অবাধ্যরা আল্লাহর আযাবের শিকার হন। তাদের ধ্বংসের পর, শুআইব (আঃ) আল্লাহর আদেশ পালন করতে থাকেন এবং আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস অটুট ছিল। কুরআনে বলা হয়েছে, "শুধুমাত্র যারা সত্যিকারের ঈমানদার ছিল এবং আল্লাহর পথে চলেছিল, তারা বেঁচে যায়।" (সূরা হুদ ১১:৯৩)।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-আ'রাফ: 7:85-93
2. সূরা হুদ: 11:84-95
3. সূরা আশ-শু'আরা: 26:176-191
4. সূরা আল-আনকাবুত: 29:36-37

১৩. ইউনুস (আঃ)

ইউনুস (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবী, যিনি নিনিবে (বর্তমান ইরাকের উত্তরাঞ্চলে) জাতির কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছানোর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের ঘটনা কুরআনে বর্ণিত রয়েছে এবং তা আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

ইউনুস (আঃ) যখন তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন, তখন তারা তার কথা অগ্রাহ্য করে। তিনি তাদেরকে আল্লাহর একত্ব, নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপন, এবং ইবাদত করার কথা বলেন, কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। তারা সেদিনের অবস্থা থেকে বের হতে চাইছিল না, নিজেদের মন্দ কাজে অটল ছিল। তাদের ওপর আল্লাহর আজাব আসবে এমন সতর্কবার্তা দেয়ার পরও তারা এতে বিশ্বাস করেনি। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "ইউনুস (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা কি আল্লাহর সাথে মজা করবে?'" (সূরা সাফফাত ৩৭:১৪২)।

আল্লাহর নির্দেশে, যখন জাতি তার কথা গ্রহণ করল না, তখন ইউনুস (আঃ) হতাশ হয়ে তাঁর সম্প্রদায় ছেড়ে চলে যান। তিনি নিনিবে থেকে বের হয়ে চলে আসেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে আল্লাহর পরিকল্পনা অন্যরকম। "তাঁর (ইউনুসের) কাহিনীর পরিণতি যখন আসে, তখন আল্লাহ তাঁকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন," (সূরা আল-সাফফাত ৩৭:১৪৫)। এই ঘটনা ছিল আল্লাহর এক পরীক্ষা, যা তিনি তাঁর নবী ইউনুস (আঃ) এর জন্য রেখেছিলেন।

ইউনুস (আঃ) যখন সমুদ্রে এসে পৌঁছান, তখন একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তাকে মাছ গিলে ফেলেছিল, সে যখন নিরাশ হয়ে পড়েছিল।" (সূরা সাফফাত ৩৭:১৪৬)। মাছের পেটে থাকাকালে ইউনুস (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যান। তিনি বলেছিলেন, "তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, আমি তো অন্যায় করেছি।" (সূরা আনবিয়া ২১:৮৭)।

ইউনুস (আঃ) এর এই দোয়া এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ তাওবা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। আল্লাহ তাকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "অতঃপর আমরা তাকে মাছের পেট থেকে বের করে আনি, এবং আমরা তাকে একটি নতুন জীবন দান করি।" (সূরা সাফফাত ৩৭:১৪৭)। আল্লাহর রহমত ও দয়ার মাধ্যমে ইউনুস (আঃ) আবার নতুন জীবন পান।

এরপর, আল্লাহ তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যেতে বলেন। তিনি ফিরে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন। এই বার্তা শেষপর্যন্ত তারা গ্রহণ করে এবং তাদের থেকে আল্লাহর আযাব টলানো হয়। কুরআনে বলা হয়েছে, "এভাবে আমরা ইউনুস (আঃ)-কে উদ্ধার করেছিলাম, এবং তাকে একটি চমৎকার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম।" (সূরা সাফফাত ৩৭:১৪৮)।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আন-নিসা: 4:163
2. সূরা আল-আনআম: 6:86
3. সূরা ইউনুস: 10:98
4. সূরা আল-আম্বিয়া: 21:87-88
5. সূরা আস-সাফফাত: 37:139-148
6. সূরা আল-কলম: 68:48-50

১৪. মুসা (আঃ)

মিসর, যেখানে ফিরাউনের অত্যাচার চলছিল, ইসরাইলি জাতি তখন ছিল নিপীড়িত। ফিরাউনের ভয় ছিল যে, ইসরাইলিদের মধ্য থেকে এক শিশু তাঁর রাজত্ব ধ্বংস করবে। তাই তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, ইসরাইলিদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানকে হত্যা করতে এবং কন্যাদের বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। মূসা (আঃ)-এর জন্ম এই কঠিন সময়ে হয়।

আল্লাহ তাআলা মূসার মা'কে নির্দেশ দেন:

"তুমি তাকে স্তন্যপান করাও। কিন্তু যদি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করো, তবে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করো এবং ভয় বা দুঃখ করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে আমার প্রেরিত পুরুষদের একজন করব।" (সূরা কাসাস, ২৮:৭)

মূসার মা আল্লাহর নির্দেশ মেনে তাঁকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। সিন্দুকটি ভেসে যায় ফিরাউনের প্রাসাদের কাছে। ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া তাকে দেখে ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে যান এবং বলেন:

"এ শিশু আমার এবং তোমার চোখের স্নেহের পাত্র হবে। তাকে হত্যা করো না। হতে পারে সে আমাদের জন্য উপকার বয়ে আনবে, অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নেব।" (সূরা কাসাস, ২৮:৯)
আল্লাহর ইচ্ছায়, মূসা (আঃ)-এর জন্য এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে তিনি শুধুমাত্র তাঁর মা'র দুধ পান করেন। এভাবেই মূসাকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল (সূরা কাসাস, ২৮:১২-১৩)।
মূসা (আঃ) ফিরাউনের প্রাসাদে বড় হতে থাকেন। একদিন তিনি দেখেন এক মিশরীয় ব্যক্তি এক ইসরাইলিকে অত্যাচার করছে। মূসা (আঃ) তাকে বাধা দিয়ে আঘাত করেন, যা তার মৃত্যুর কারণ হয়। এই ঘটনা তাঁকে ভীত করে তোলে। তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, এবং আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন (সূরা কাসাস, ২৮:১৪-১৬)।
পরের দিন তিনি আবার একই ধরনের একটি ঘটনার সম্মুখীন হন। এবার সেই ইসরাইলি লোক তাঁকে ভুল বোঝায় এবং তাঁর পরিচয় ফাঁস করে দেয়। মূসা (আঃ) বুঝতে পারেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন। তিনি মিশর ত্যাগ করে মাদইয়ান চলে যান (সূরা কাসাস, ২৮:২১)।
মাদইয়ানে পৌঁছে মূসা (আঃ) একটি কূপের পাশে দুই তরুণীকে দেখতে পান, যারা অন্যদের পশুদের জন্য কূপ থেকে পানি তুলতে সমস্যায় পড়ছিল। মূসা (আঃ) তাদের সাহায্য করেন। তরুণীদের বাবা শুআইব (আঃ) মূসাকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমন্ত্রণ জানান। শুআইব (আঃ) মূসাকে তাঁর কন্যাদের একজনকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, যার বিনিময়ে তাঁকে আট বা দশ বছর কাজ করতে হবে। মূসা (আঃ) এই শর্ত গ্রহণ করেন এবং শুআইব (আঃ)-এর কন্যাকে বিবাহ করেন (সূরা কাসাস, ২৮:২২-২৮)।
দীর্ঘ বছর পর, মূসা (আঃ) তাঁর পরিবার নিয়ে মিশরে ফিরে আসার পথে তূর পর্বতের কাছে একটি আগুন দেখতে পান। তিনি আগুনের কাছে যান উষ্ণতা ও দিকনির্দেশনার আশায়। সেখানে আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলেন:
"হে মূসা, আমিই আল্লাহ, পৃথিবী ও আকাশের প্রভু।" (সূরা ত্বা-হা, ২০:১১-১৪)
আল্লাহ তাঁকে দুটি অলৌকিক নিদর্শন দেন: তাঁর লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া এবং তাঁর হাত সাদা হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাঁকে ফিরাউনের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন, যাতে তিনি ইসরাইলিদের মুক্তি দাবি করেন (সূরা ত্বা-হা, ২০:১৭-২৩)।
মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাই হারুন (আঃ) আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ফিরাউনের কাছে যান। তাঁরা বলেন:
"আমরা পৃথিবীর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রেরিত হয়েছি। তুমি ইসরাইলিদের আমাদের সঙ্গে যেতে দাও।" (সূরা শু'আরা, ২৬:১৬-১৭)
ফিরাউন তাঁদের দাবিকে উপহাস করে এবং মূসাকে অলৌকিক নিদর্শন দেখাতে বলেন। মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি ফেললে তা সাপ হয়ে যায়। তিনি তাঁর হাত বের করলে তা উজ্জ্বল হয়ে

ওঠে। কিন্তু ফিরাউন ও তাঁর সভাসদরা এই নিদর্শনকে জাদু বলে আখ্যা দেয় এবং নিজেদের জাদুকরদের নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ দেয় (সূরা শু'আরা, ২৬:১৮-৩৩)।

ফিরাউন তার সেরা জাদুকরদের আহ্বান করেন। প্রতিযোগিতার দিন জাদুকররা তাঁদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করে, যা দর্শকদের চোখে সাপের মতো মনে হয়। মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি ফেলেন, যা সেগুলোকে গ্রাস করে। জাদুকররা বুঝতে পারে এটি জাদু নয়, বরং একটি অলৌকিক নিদর্শন। তারা মূসার প্রতি ঈমান আনয়ন করে। ফিরাউন এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের হত্যা করার হুমকি দেন (সূরা ত্বা-হা, ২০:৬৫-৭৩)।

ফিরাউন ইসরাইলিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান। আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন শাস্তি পাঠান: প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত। প্রতিবারই ফিরাউন তওবা করার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু শাস্তি শেষ হলে তা ভঙ্গ করেন (সূরা আরাফ, ৭:১৩০-১৩৫)।

শেষমেশ, মূসা (আঃ) ইসরাইলিদের নিয়ে মিসর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। আল্লাহর নির্দেশে, তিনি রাতে তাদের নিয়ে রওনা হন। সকালে ফিরাউন ও তাঁর বাহিনী তাদের তাড়া করে। আল্লাহর কুদরতে সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে পথ তৈরি হয়, এবং ইসরাইলিরা নিরাপদে পার হয়ে যায়। ফিরাউন ও তাঁর বাহিনী সেই পথে প্রবেশ করলে সমুদ্র তাদের গ্রাস করে (সূরা শু'আরা, ২৬:৫২-৬৮)।

মুক্তির পর ইসরাইলিরা নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তারা একসময় এক গাভির পূজা শুরু করে। মূসা (আঃ) তাদের কঠোর শাসন করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান (সূরা বাকারা, ২:৫১-৫৪)।

মূসা (আঃ) তূর পর্বতে আল্লাহর সাথে কথা বলতে যান এবং তাওরাত লাভ করেন। এটি ছিল ইসরাইলিদের জন্য বিধানস্বরূপ। আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি রাখার নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা বারবার তা লঙ্ঘন করে (সূরা আরাফ, ৭:১৪২-১৪৫)।

মূসা (আঃ) তাঁর পুরো জীবন আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। তিনি ইসরাইলিদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কুরআনের ভাষ্যমতে, তাঁর জীবনী ধৈর্য, ত্যাগ এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার প্রতীক।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা: 2:49-61, 67-71
2. সূরা আন-নিসা: 4:153-162
3. সূরা আল-মায়েদা: 5:20-26
4. সূরা আল-আনআম: 6:84-91
5. সূরা আল-আরাফ: 7:103-162
6. সূরা ইউনুস: 10:75-93
7. সূরা হুদ: 11:96-99
8. সূরা ইবরাহিম: 14:5-8

9. সূরা আল-ইসরা (বনী ইসরাইল): 17:2-8, 101-104
10. সূরা আল-কাহফ: 18: 60-82
11. সূরা মরিয়ম: 19:51-53
12. সূরা ত্বহা: 20: 9-98
13. সূরা আল-আম্বিয়া: 21:48-50
14. সূরা আল-মুমিনুন: 23:45-49
15. সূরা আশ-শু'আরা: 26:10-68
16. সূরা আন-নামল: 27:7-14
17. সূরা আল-কাসাস: 28:3-46
18. সূরা আল-আহজাব: 33:69
19. সূরা আস-সাফফাত: 37:114-122
20. সূরা মু'মিনুন: 40:23-54
21. সূরা আয-জুখরুফ: 43:46-56
22. সূরা আদ-দুখান: 44:17-33
23. সূরা আল-আহকাফ: 46:12
24. সূরা আয-যারিয়াত: 51:38-40
25. সূরা আন-নাজম: 53:36
26. সূরা আল-হাদিদ: 57:25

১৫. হারুন (আঃ)

হারুন (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন নবী, যিনি মুসা (আঃ)-এর সহযাত্রী হিসেবে আল্লাহর বার্তা প্রচার করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুসা (আঃ)-এর ভাই এবং তাঁর সহায়ক, যিনি আল্লাহর পথে মুসা (আঃ)-এর সাহায্য করেছিলেন এবং তার কষ্টে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মুসা (আঃ) যখন ফিরআউনের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছাতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হন, তখন আল্লাহ তাআলা হারুন (আঃ)-কে তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। মুসা (আঃ)-এর মুখে ভাষা বা বাক-প্রতিবন্ধকতা ছিল, তাই আল্লাহ তাকে সাহায্য হিসেবে হারুন (আঃ)-কে পাঠান, যাতে মুসা (আঃ) তার কথা সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দিতে পারেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তুমি এবং তোমার ভাইকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠাচ্ছ, তোমরা ভয় পেও না।" (সূরা আল-আরাফ ৭:১৫৪)

হারুন (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ এবং বিশ্বস্ত একজন নবী। তিনি তাঁর ভাই মুসা (আঃ)-এর সাথে একযোগে মিশরী জাতিকে আল্লাহর পথ দেখাতে, ফিরআউনকে সাবধান করতে এবং ইসরায়েলিদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে থাকেন। যখন মুসা (আঃ) তূর পাহাড়ে আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য চলে যান, তখন হারুন (আঃ) ইসরায়েলিদের মধ্যে

নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এই সময়ে, ইসরায়েলিদের মধ্যে কিছু মানুষ গো পূজা শুরু করে। হারুন (আঃ) তাদের বাধা দেন, কিন্তু তারা তা মানেনি। কুরআনে হারুন (আঃ)-এর জন্য বলা হয়েছে, "হারুন (আঃ) বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে বিরক্ত করছো, যখন তোমরা জানো না যে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত ছিলাম?' " (সূরা ত্বহা ২০:৯৭)

মুসা (আঃ)-এর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে ইসরায়েলিদের মাঝে গো পূজার ঘটনা ঘটে, এবং তারা হারুন (আঃ)-কে ত্যাগ করে। হারুন (আঃ) তাদেরকে শান্তি এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে ফিরে আসার জন্য বারবার আহ্বান করেন, কিন্তু কিছু মানুষ তার কথা শোনে না। এক পর্যায়ে, মুসা (আঃ) ফিরে এসে হারুন (আঃ)-এর এই সংগ্রাম এবং ইসরায়েলিদের গো পূজার ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হন। হারুন (আঃ) তার ভাইয়ের সামনে সাফাই দেয়, তিনি বলেছিলেন, "আমি তাদেরকে শান্তি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে উপেক্ষা করেছে।" (সূরা ত্বহা ২০:৯৮)

হারুন (আঃ)-এর সহানুভূতি এবং ন্যায়পরায়ণতা তার জীবনকে আল্লাহর পথের অনুসরণকারী হিসেবে গড়ে তোলে। মুসা (আঃ)-এর সাথে তার সম্পর্ক ছিল এক নিখুঁত সহযোগিতা, যেখানে তিনি একে অপরকে সমর্থন দিয়ে নিজেদের কাজ সম্পাদন করতেন। মুসা (আঃ) যখন মিশরে ফিরআউনের সামনে আল্লাহর নির্দেশ উপস্থাপন করেন, তখন হারুন (আঃ) তাকে সহায়তা প্রদান করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা: 248
2. সূরা আন-নিসা: 163
3. সূরা আল-আরাফ: 142-151
4. সূরা ইউনুস: 75-93
5. সূরা মারিয়াম: 53
6. সূরা ত্বহা: 29-36, 42-98
7. সূরা আশ-শু'আরা: 13, 48-49
8. সূরা আন-নমল: 7-12
9. সূরা আল-কাসাস: 34-35, 43
10. সূরা আস-সাফফাত: 114-122

১৬. ইলিয়াস (আঃ)

ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহর একজন মহান নবী, যাঁর জীবনের ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ইলিয়াস (আঃ)-এর সময়েও অনেক লোক শির্কে মগ্ন ছিল এবং তিনি তাদেরকে আল্লাহর

একত্বের প্রতি আহ্বান করেন। তিনি বনী ইসরাইল জাতির মধ্যে জীবিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল এক নিষ্ঠাবান আল্লাহর পথ অনুসরণকারী নবীর জীবন, যিনি আল্লাহর আদেশ পালন করতে গিয়ে একাধিক প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছিলেন।

ইলিয়াস (আঃ)-এর সময় তাঁর সম্প্রদায়টি বাল (বৈল) নামে এক মূর্তি পূজায় রত ছিল। আল্লাহর আদেশে, ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করেন। তবে, তার সম্প্রদায় তাকে অস্বীকার করেছিল এবং তার দিকে অহংকার এবং গর্বের সাথে তাকিয়ে ছিল। ইলিয়াস (আঃ) তাদের কাছে বারবার আল্লাহর একত্বের কথা বলেছেন, কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেনি। কুরআনে ইলিয়াস (আঃ)-এর এই সংগ্রামের বিষয়টি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে:

“ইলিয়াসও (আঃ) ছিলেন একজন নবী। তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তার বাইরে তোমরা আর কারো ইবাদত করো না, তোমরা কি ভয় পাও না?’ ” (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১২২)

এভাবে, ইলিয়াস (আঃ) তার সম্প্রদায়কে বারবার সতর্ক করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে। তাদের শির্কের আচরণের কারণে আল্লাহ তাদের ওপর শাস্তি পাঠানোর হুমকি দেন।

তবে, ইলিয়াস (আঃ)-এর প্রচেষ্টার পরেও যখন তার সম্প্রদায় ফিরে আসেনি, আল্লাহ তাকে আশ্বাস দেন এবং তাঁকে আরো দৃঢ়তার সাথে তাঁর মিশন চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। কুরআনে বলা হয়েছে:

“এবং ইলিয়াস (আঃ)-এর ব্যাপারে বলা হয়, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে বলেছিলেন, ‘তোমরা কেন আল্লাহর একত্ব থেকে বিচ্যুত হচ্ছো? কি তোমরা ভয় পাচ্ছো?’” (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১২৪)

এছাড়া, কিছু জায়গায় বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ)-কে আল্লাহ এক সময়ে তাদের থেকে দূরে চলে যেতে বলেছিলেন, এবং তিনি সেই সময় আল্লাহর আদেশ পালন করেছিলেন।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-আনআম: 85
2. সূরা আস-সাফফাত: 123-132

১৭. যাকারিয়া (আঃ)

যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবী, যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথ দেখানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। কুরআনে তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, যা তাঁর জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলো এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আনুগত্যকে তুলে ধরে।

যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন ইসরায়েলদের মধ্যে একজন শ্রদ্ধেয় নবী। তিনি একজন ধার্মিক, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস রাখতেন এবং তাঁর জাতিকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করতেন। তবে, এক সময় তার বয়স অনেক বেড়ে যায় এবং তার স্ত্রীরও সন্তান জন্ম দেওয়ার বয়স পেরিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে, তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর অবস্থা বর্ণনা করেন:
“তখন তিনি বললেন, ‘হে আমার রব! আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মাথা সাদা হয়ে গেছে, আর আমি কখনোই তোমার কাছে কিছু চাইনি। তবে, হে আমার রব! তুমি যদি আমাকে একটি উত্তম সন্তান দাও, তবে আমি নিশ্চিতভাবেই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।’” (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৪)
যাকারিয়া (আঃ) যখন আল্লাহর কাছে সন্তান প্রার্থনা করেন, তখন আল্লাহ তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাকে একটি পুত্র সন্তান দেবেন, যিনি সমাজে তাঁর পিতা-মাতার উত্তরসূরি হবেন। আল্লাহ তাকে সন্তানের খুশি ঘোষণা দেন, কিন্তু সে সময় তার বয়স এবং স্ত্রীর বয়সের কারণে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে, আল্লাহ তাকে আশ্বস্ত করেন এবং বলেন যে, তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করা হবে। কুরআনে এর বর্ণনা রয়েছে:
“তিনি (যাকারিয়া) বললেন, ‘হে আমার রব! আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, আমি কীভাবে সন্তান পাবো?’ আল্লাহ বললেন, ‘এভাবে তোমার রব বলেছেন, এটি আমার জন্য কিছুই নয়। আমি তো তোমাকে একটি পুত্র দেব, যাঁর নাম হবে ইয়াহিয়া (আঃ)।
যাকারিয়া (আঃ)-এর এই প্রার্থনা আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস এবং তাঁর কাছে নিরন্তর সাহায্য চাওয়ার একটি সুন্দর উদাহরণ। আল্লাহ তাঁকে সন্তান দান করেন এবং তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তাঁর সন্তানের নাম ছিল ইয়াহিয়া (আঃ), এবং তিনি ছিলেন একজন মহান নবী।
যাকারিয়া (আঃ)-এর জীবনের একটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল তাঁর জীবনসঙ্গী ও উপদেশদানের ক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকা। আল্লাহর পথের জন্য তিনি কখনও কোন বাধাকে ভেঙে ফেলেননি। বরং, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর একত্বের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন। কুরআনে বলা হয়েছে:
“তাঁর (যাকারিয়া) জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা এমন ছিল যে, আল্লাহ তাঁকে প্রচুর ধৈর্য, দয়া এবং ভালোবাসার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।” (সূরা আলে ইমরান ৩:৩৫)

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আলে ইমরান: 37-41
2. সূরা মারিয়াম: 2-15
3. সূরা আল-আম্বিয়া: 89-90

১৮. ইয়াহইয়া (আঃ)

ইয়াহইয়া (আঃ) ছিলেন আল্লাহর এক মহান নবী, যাঁর জীবন ছিল পূর্ণরূপে আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর আদেশ পালন করার জন্য নিবেদিত। ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জন্ম ছিল এক অবিশ্বাস্য ও আশ্চর্য ঘটনা। তাঁর বাবা ছিলেন নবী যাকারিয়া (আঃ), যিনি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান কামনা করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জন্মের ব্যাপারে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন:

"যাকারিয়া (আঃ) যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আল্লাহ বলেছিলেন, 'এভাবে তোমার রব বলেছেন, এটি আমার জন্য কিছুই নয়। আমি তো তোমাকে একটি পুত্র দেব, যাঁর নাম হবে ইয়াহইয়া

এটি ছিল আল্লাহর এক অসীম দয়া, যিনি যাকারিয়া (আঃ)-এর বয়সের বৃদ্ধির পরও তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন এবং তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন, যাঁর নাম রাখা হয় ইয়াহইয়া (আঃ)। ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জন্ম ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নিদর্শন এবং তাঁর প্রতি নির্ভরতার প্রতীক।

ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল তাঁর নৈতিকতা, পরিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস। তিনি ছিলেন একান্তভাবে আল্লাহর পথে নিবেদিত এবং তাঁর সমাজে পাপাচারের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। কুরআনে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"'হে ইয়াহইয়া! তুমি কিতাব গ্রহণ করো। আর আমরা তাকে ছোট বয়সে প্রজ্ঞা দান করেছি।'" (সূরা মারিয়াম ১৯:১২)

ইয়াহইয়া (আঃ) ছোট বয়সেই মহান প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন এবং আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর একত্বের প্রতি আহ্বান জানাতেন এবং পাপাচারের বিরুদ্ধে সচেতন করতেন। তাঁর নৈতিকতা এবং ধার্মিকতা ছিল অম্লান, এবং তাঁর জীবন ছিল পুরোপুরি আল্লাহর আদেশ পালন এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য নিবেদিত।

এছাড়া, ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জীবন ছিল এক নিষ্ঠাবান পথের অনুসরণ, যেখানে তিনি নিজের প্রজন্মের লোকদের শির্ক থেকে দূরে রাখতে এবং আল্লাহর পথে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করতেন। তাঁর আহ্বান ছিল স্পষ্ট, তিনি আল্লাহর পথে চলতে এবং তাঁর একত্বে বিশ্বাস রাখতে নির্দেশনা দিতেন। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"'হে ইয়াহইয়া! তুমি ঈমান আনো এবং আল্লাহর পথে নির্দেশ দাও।'" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৯১)

ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জীবন ছিল এক প্রকার সংগ্রাম, যেখানে তিনি একে একে বিভিন্ন বিপদ ও প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করেছেন, কিন্তু তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য কখনও কমেনি। একদিন তিনি ইসরাইলীদের কাছে এসে তাঁদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তাঁর উপদেশকে উপেক্ষা করেছিল। তিনি তাঁদেরকে

সৎপথে চলার আহ্বান জানালেও অনেকেই তাঁকে অস্বীকার করেছিল এবং মিথ্যাবাদী ও ধ্বংসকারী বলে গণ্য করেছিল।
ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জীবনের এক বড় ঘটনা ছিল তাঁর শাহাদত। তাঁর জীবন, কর্ম এবং মৃত্যু আল্লাহর আদেশ ও হুকুম অনুসরণে ছিল নিখুঁত। কুরআনে তাঁর শাহাদত সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলা হয়নি, তবে তাফসির থেকে জানা যায় যে, ইয়াহইয়া (আঃ)-কে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে শাহাদত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবন ছিল উজ্জ্বল, কারণ তাঁর পরিশুদ্ধতা এবং ঈমানী দৃঢ়তা চিরকাল মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত থাকবে।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আলে ইমরান: 39
2. সূরা মারিয়াম: 7-15
3. সূরা আল-আম্বিয়া: 90

১৯. আল-ইয়াসা (আঃ)

আল-ইয়াসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবী, যিনি ইসরায়েলদের মধ্যে আল্লাহর পথ দেখানোর জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। কুরআনে তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা বর্ণিত না হলেও, তাঁর নাম ও তাঁর কাজের কিছু বিশেষ দিক উল্লেখ রয়েছে। আল-ইয়াসা (আঃ)-এর জীবনের ঘটনা মূলত তাঁর পূর্বসূরি, নবী ইলিয়াস (আঃ)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত, যিনি তাঁর পরবর্তী পদে নবী হিসেবে নির্বাচিত হন।
কুরআনে আল-ইয়াসা (আঃ)-এর উল্লেখ খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে তিনি ছিলেন একজন সরল, ন্যায়পরায়ণ এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তাঁর জীবন ছিল একান্তভাবে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানো এবং তাঁর সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা করা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁর ব্যাপারে বলেন:
"আর আমরা আল-ইয়াসা (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম, সে ছিল ভালো, নির্ভীক এবং ইসলামের পথে আহ্বানকারী।"
ইয়াসা (আঃ)-এর জীবন ছিল এক নিষ্ঠাবান পথ অনুসরণের সংগ্রাম। তিনি নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের শির্ক থেকে বিরত থাকতে এবং আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস রাখতে আহ্বান জানাতেন। তাঁর জীবন ছিল পূর্ববর্তী নবীদের মতোই কঠিন, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি অগাধ আনুগত্য তাঁকে একজন সফল নবী বানিয়েছিল।
এছাড়া, আল-ইয়াসা (আঃ)-এর জীবন নিয়ে কিছু মর্মান্তিক ঘটনা বা ঘটনাবলী কুরআনে উল্লেখ করা না হলেও, তাফসির ও অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থে তাঁর কাজ এবং জীবনযাত্রার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। তাঁকে ইলিয়াস (আঃ)-এর উত্তরসূরি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল, এবং তাঁর দায়িত্ব ছিল ঈমানদারদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করা। তাফসিরে

বলা হয়েছে, আল-ইয়াসা (আঃ)-এর কাজ ছিল তাঁর সম্প্রদায়কে সঠিক পথে আনার জন্য উদ্দীপ্ত করা এবং আল্লাহর আদেশে তাদের ফিরিয়ে আনা।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-আনআম: 86
2. সূরা সাদ: 48

২০. যুল-কিফল (আঃ)

যুল-কিফল (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন শ্রদ্ধেয় নবী, যাঁর সম্পর্কে কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে অনেক কিছু বলা হয়নি। তবে তাঁর নাম ও কিছু ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত রয়েছে। যুল-কিফল (আঃ)-এর জীবন অনেকটা নবী আইয়ুব (আঃ)-এর মতো, যারা কঠিন পরীক্ষা ও বিপদের মধ্যে থেকেও আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস রেখেছিলেন।

কুরআনে যুল-কিফল (আঃ)-এর জীবনের কিছু দিক খুবই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সৎপথে চলতে, তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে এবং জীবনভর তাঁর আদেশ পালন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কুরআনে যুল-কিফল (আঃ)-এর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে:

"আর (তাঁর সম্পর্কে) কিতাবে যুল-কিফলকে (উল্লেখ কর), নিশ্চয় সে ছিল একজন নেক লোক।"

এটি থেকে বোঝা যায় যে, যুল-কিফল (আঃ) ছিলেন এক মহান চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে এবং তাঁর আদেশ পালন করতে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করেছেন। তাঁর জীবন ছিল এক নিখুঁত আনুগত্য এবং ঈমানের প্রতীক, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিতেন।

তাফসির গ্রন্থসমূহে বলা হয়, যুল-কিফল (আঃ) ছিলেন এক মহান দয়ালু ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর রাহে কঠিন সংগ্রাম করেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করেছেন। তবে তাঁর জীবনের বিশেষ কোনো বিস্তারিত ঘটনা কুরআনে সঠিকভাবে বর্ণিত হয়নি, তবে তাঁকে অনেকাংশে নবী আইয়ুব (আঃ)-এর মতো ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এছাড়া, কিছু তাফসিরের মতে, যুল-কিফল (আঃ) নবী আইয়ুব (আঃ)-এর মতই এক কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যে, তিনি জীবনে বহু বছর ধরে আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন, আবার তাঁর সেবায় তিনি এমন কঠিন পরীক্ষা থেকে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং, তাঁর জীবনের শিক্ষা হল ধৈর্য, দৃঢ় বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-আম্বিয়া: 85
2. সূরা সাদ: 48

২১. দাউদ (আঃ)

দাউদ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবী ও বাদশাহ, যিনি তাঁর ঈমান, সাহসিকতা, ন্যায়বিচার এবং সঙ্গীতের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। কুরআন ও তাফসির গ্রন্থে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে অনেক রহমত ও বিশেষ ক্ষমতা দান করেছিলেন, যা তাঁকে একজন আদর্শ নেতা ও নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

দাউদ (আঃ)-এর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো জালুতের (গোলিয়াথ) বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়। বনী ইসরাঈলের জাতি তখন শত্রুদের দ্বারা চরমভাবে নিপীড়িত হচ্ছিল। জালুত ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর শাসক। যুদ্ধে জালুতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য কেউ সাহস করছিল না। সেই মুহূর্তে দাউদ (আঃ), যিনি তখন এক তরুণ যোদ্ধা ছিলেন, আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে এগিয়ে আসেন। আল্লাহর সাহায্যে তিনি একটি গুলতি ব্যবহার করে জালুতকে পরাস্ত করেন। এই বিজয় দাউদ (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন মহান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"তারা আল্লাহর হুকুমে তাদের শত্রুদের পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং যা ইচ্ছা শিখালেন।" (সূরা আল-বাকারা ২:২৫১)

আল্লাহ দাউদ (আঃ)-কে অনেক বিশেষ দান করেছিলেন। তাঁকে অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ প্রদান করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, পাহাড় ও পাখিরাও তাঁর সাথে আল্লাহর জিকিরে সুর মেলাতো:

"হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো, আর পাখিদেরকেও।" (সূরা সাবা ৩৪:১০)

দাউদ (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ শাসক। আল্লাহ তাঁকে "যাবুর" দান করেছিলেন, যা বনী ইসরাঈলের জন্য ধর্মীয় বিধান ও নির্দেশনাসমূহ ধারণ করত। তিনি সবসময় আল্লাহর পথে চলতে এবং নিজের জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

তাঁর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো "দাউদের বিচার" (হাকাম)। একবার দুজন ব্যক্তি তাঁর কাছে এক ভেড়ার মালিকানা নিয়ে মামলা নিয়ে আসেন। দাউদ (আঃ) আল্লাহর অনুগ্রহে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করে সমস্যা সমাধান করেন। কুরআনে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা তাঁর প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতার একটি উদাহরণ:

"আর আমি তার রাজ্য মজবুত করেছিলাম, তাকে প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা দান করেছিলাম।" (সূরা ছাদ ৩৮:২০)
তাঁর জীবনে কিছু পরীক্ষাও এসেছিল। আল্লাহ তাঁকে কঠিন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা করেন, এবং তিনি সবসময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দাউদ (আঃ)-এর এই তাওবা করার গুণ তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা: 251
2. সূরা আন-নিসা: 163
3. সূরা আল-আনআম: 84
4. সূরা আল-ইসরা (বনী ইসরাইল): 55
5. সূরা আল-আম্বিয়া: 78-80
6. সূরা আল-হজ: 15
7. সূরা আন-নমল: 15-16
8. সূরা সাবা: 10-11
9. সূরা সাদ: 17-26

২২. সুলায়মান (আঃ)

সুলায়মান (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবী এবং দাউদ (আঃ)-এর পুত্র। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, এবং অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই ছিল আল্লাহর করুণা ও আশীর্বাদের প্রতিফলন। তাঁর নেতৃত্ব ও বিচারব্যবস্থা, জিন-ইনসানের ওপর প্রভুত্ব, এবং আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্য কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে।
সুলায়মান (আঃ)-এর শৈশব থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার দুটি নারীর মধ্যে একটি শিশুকে নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। উভয়েই দাবি করে যে শিশুটি তাদের। এই মামলাটি দাউদ (আঃ)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সুলায়মান (আঃ), যিনি তখন তরুণ ছিলেন, প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি রায় দেন। তিনি বললেন, শিশুটিকে দুই টুকরো করে উভয়কে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হোক। প্রকৃত মা, যিনি সন্তানের ক্ষতি চাননি, শিশুটিকে অন্য নারীর হাতে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন। এর মাধ্যমে সুলায়মান (আঃ) প্রকৃত মাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। এই ঘটনা তাঁর প্রজ্ঞার উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয়। (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭৮-৭৯)

আল্লাহ তাআলা সুলায়মান (আঃ)-কে জিন, পশু-পাখি এবং বাতাসের ওপর বিশেষ ক্ষমতা দান করেছিলেন। তিনি পাখি ও অন্যান্য প্রাণীদের ভাষা বুঝতে পারতেন। একবার তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পিঁপড়াদের দল নিজেদের রক্ষার জন্য সতর্ক হয়।
পিঁপড়ার নেত্রীর কথায় সুলায়মান (আঃ) হাসেন এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন:
"সুলায়মান তার বাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে জিন, মানুষ এবং পাখিরা ছিল। এক পিঁপড়া বলল: 'হে পিঁপড়ারা! তোমরা তোমাদের গর্তে প্রবেশ করো, যাতে সুলায়মান এবং তার বাহিনী তোমাদের পিষে না দেয়।' তিনি পিঁপড়ার কথায় মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'হে আমার প্রভু! আমাকে অনুগ্রহ করো যেন আমি তোমার দেওয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।'"
সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো সাবার রাণী বিলকিসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। পাখি হুদহুদ তাঁর কাছে সংবাদ নিয়ে আসে যে, সাবার রাণী ও তাঁর জাতি সূর্য পূজা করে। সুলায়মান (আঃ) রাণীকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। রাণী প্রথমে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু সুলায়মান (আঃ)-এর জ্ঞানের প্রমাণ দেখে এবং তাঁর প্রাসাদে গিয়ে আল্লাহর শক্তির প্রতি তিনি মুগ্ধ হন। পরিশেষে, রাণী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সুলায়মান (আঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।
সুলায়মান (আঃ)-এর ক্ষমতা শুধু মানবজাতি বা প্রাণীকুলে সীমাবদ্ধ ছিল না, বাতাসও তাঁর নির্দেশ মেনে চলত। আল্লাহ তাঁকে জিনদের ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রদান করেছিলেন। তাঁরা তাঁর নির্দেশে বিভিন্ন কাজ করত, যেমন প্রাসাদ নির্মাণ, ভাস্কর্য তৈরি ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন:
"আমি তাঁর জন্য বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম, যা তাঁর আদেশে বয়ে যেত। আর জিনদের তাঁর অধীনে করেছিলাম, যারা তাঁর জন্য প্রাসাদ ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করত।" (সূরা সাবা ৩৪:১২-১৩)
সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুও একটি শিক্ষা বহন করে। তাঁর মৃত্যু এমন অবস্থায় হয়েছিল, যখন তিনি জিনদের কাজে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তাঁর লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তিনি মারা যান, এবং তাঁর মৃত্যু কেউ টের পায়নি। যখন তাঁর লাঠি পোকায় খেয়ে ফেলল, তখন তিনি পড়ে গেলেন। এর মাধ্যমে জিনেরা বুঝতে পারল, তাঁরা অদৃশ্য জগতের খবর জানে না। (সূরা সাবা ৩৪:১৪)

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা: 102
2. সূরা আন-নিসা: 163
3. সূরা আল-আনআম: 84
4. সূরা আল-আম্বিয়া: 78-82
5. সূরা আন-নমল: 15-44

6. সূরা সাবা: 12-14
7. সূরা সাদ: 30-40

২৩. আইয়্যুব (আঃ)

আইয়্যুব (আঃ)-এর জীবনী আল্লাহর প্রতি ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুরআনে তাঁর নাম ৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর জীবনের ঘটনা বিশেষত তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ আস্থার প্রতীক। তিনি ছিলেন ধনী, সম্মানিত এবং আল্লাহর নিকটবর্তী একজন নবী। তাঁর প্রচুর সম্পদ, পরিবার এবং অনুসারী ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে ধৈর্যের পরীক্ষায় ফেলেন, যা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।
আইয়্যুব (আঃ) দীর্ঘদিন সম্পদ, পরিবার এবং স্বাস্থ্যগত সমৃদ্ধিতে জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন। তাঁর সব সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, সন্তানরা মারা যায়, এবং তিনি একটি গুরুতর চর্মরোগে আক্রান্ত হন। এমনকি তাঁর বন্ধুরা ও প্রতিবেশীরাও তাঁকে ছেড়ে যায়। কিন্তু এই চরম কষ্টেও তিনি কখনো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বন্ধ করেননি এবং ধৈর্য ধারণ করে বলতেন:
"নিশ্চয়ই আমি আমার কষ্টের ভার আল্লাহর নিকট তুলে ধরেছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩)
এমনকি তাঁর স্ত্রী, যিনি তাঁর একমাত্র সঙ্গী হিসেবে পাশে ছিলেন, তাঁকে একটি সান্ত্বনার পরামর্শ দেন। তিনি বললেন, "তুমি কি আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দোয়া করছ না?"
উত্তরে আইয়্যুব (আঃ) বলেন, "আল্লাহ আমাকে দীর্ঘসময় সুখ ও সমৃদ্ধিতে রেখেছেন। আমি কীভাবে কয়েক বছরের পরীক্ষায় অস্থির হয়ে যাব?" এটাই ছিল তাঁর ধৈর্যের উজ্জ্বল উদাহরণ।
একসময়, আইয়্যুব (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং বললেন:
"হে আমার প্রতিপালক! আমি বিপদে পড়েছি এবং আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ছাদ ৩৮:৪১)
আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁকে আরোগ্য দান করেন। আল্লাহ তাঁকে বলেন:
"পায়ের আঘাত করো। এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে শীতল পানি প্রবাহিত, তা পান করো এবং তাতে গোসল করো।"
এভাবে আল্লাহ তাঁকে রোগমুক্ত করেন এবং তাঁর সম্পদ ও সন্তানদের আবার ফিরিয়ে দেন। এমনকি আল্লাহ তাঁর সম্পদের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেন। তাঁর ধৈর্য ও ঈমানের জন্য আল্লাহ তাঁকে প্রশংসিত করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক আদর্শ হিসেবে রেখে যান:
"আমরা তাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! সে ছিল অত্যন্ত অনুগত।" (সূরা সাদ ৩৮:৪৪)

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আন-নিসা: 163
2. সূরা আল-আনআম: 84
3. সূরা আল-আম্বিয়া: 83-84
4. সূরা সাদ: 41-44

২৪. ঈসা (আঃ)

ঈসা (আঃ)-এর জীবনী আল্লাহর এক অনন্য নিদর্শন। কুরআনে তাঁর জীবন এবং মিরাকলসমূহ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ঈসা (আঃ) ছিলেন মারইয়ামের (আঃ)-এর পুত্র। তাঁর জন্মের ঘটনা ছিল অলৌকিক এবং তা মানবজাতির জন্য একটি বিশেষ শিক্ষা। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং তাঁর নবুয়তের মিশন বর্ণিত হয়েছে।

মারইয়াম (আঃ) একজন পবিত্র ও ধার্মিক নারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীর সমস্ত নারীর মধ্যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। একদিন মারইয়াম (আঃ) ইবাদতের জন্য নির্জন স্থানে গেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে ঘোষণা দেন যে, তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবেন। তিনি বিস্ময় নিয়ে বলেন:

"হে আমার রব! আমার কিভাবে সন্তান হবে, যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি?"

ফেরেশতা উত্তর দেন:

"এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তিনি যা চান, তাই সৃষ্টি করেন। তিনি কোনো বিষয়ে বলেন, 'হও,' এবং তা হয়ে যায়।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৪৭)

এরপর অলৌকিকভাবে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়। যখন মারইয়াম (আঃ) সন্তানসহ জনগণের কাছে আসেন, তখন লোকেরা তাঁর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। কিন্তু আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে শিশু অবস্থায় কথা বলার ক্ষমতা দান করেন। তিনি বলেন:

"আমি আল্লাহর বান্দা। আমাকে তিনি কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।" (সূরা মারইয়াম ১৯:৩০)

এভাবে আল্লাহ মারইয়াম (আঃ)-এর চরিত্র রক্ষা করেন এবং ঈসা (আঃ)-এর নবুয়তের ঘোষণা দেন।

ঈসা (আঃ)-এর নবুয়ত ছিল তার জাতির প্রতি বিশেষ করে বনী ইসরাইলের জন্য। আল্লাহতালা তাকে ইঞ্জিল নামক কিতাব দান করেন। আল্লাহ তাঁকে বেশ কিছু মিরাকল করার ক্ষমতা দেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন, এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দিতেন। তিনি বলেন:

"আমি আল্লাহর অনুমতিতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করি এবং রোগমুক্ত করি।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৪৯)

তাঁর এই মিরাকলগুলো ছিল আল্লাহর অস্তিত্ব ও শক্তির স্পষ্ট প্রমাণ।

ঈসা (আঃ)-এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তাঁর প্রতি শত্রুদের ষড়যন্ত্র। বনী ইসরাইলের কিছু লোক তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ বলেন:

"তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, এবং আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়েছিলেন।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৫৪)

তারা বিশ্বাস করেছিল যে, তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে বা ক্রুশবিদ্ধ করেছে। কিন্তু আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় তাঁর কাছে উঠিয়ে নেন। কুরআন স্পষ্ট করে বলে:

"তারা তাঁকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।" (সূরা আন-নিসা ৪:১৫৭-১৫৮)

ঈসা (আঃ)-এর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের আগে তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর মিশন সম্পূর্ণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে পরাজিত করবেন এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-ইমরান: 3:45-59
2. সূরা নিসা: 4:157-159, 171-172
3. সূরা মায়েদা: 5:17, 46, 72-75, 110-120
4. সূরা আনআম: 6:85
5. সূরা তওবা: 9:30-31
6. সূরা মারইয়াম: 19:16-36
7. সূরা আম্বিয়া: 21:91-92
8. সূরা মুমিনুন: 23:50
9. সূরা আহযাব: 33:7
10. সূরা শূরা: 42:13
11. সূরা জুখরুফ: 43:57-61, 63-65
12. সূরা হাদিদ: 57:27
13. সূরা সফ: 61:6, 14

২৫. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন এবং নবুওয়াত সম্পর্কে আল কুরআন অসাধারণভাবে বর্ণনা করেছে। তার জীবন ছিল মানুষের জন্য এক নিখুঁত আদর্শ, যা প্রতিটি

দিক থেকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে। এই পবিত্র গ্রন্থে মুহাম্মাদ (সা.)-কে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁর চরিত্র, দায়িত্ব, এবং তাঁকে ঘিরে সংঘটিত ঘটনাগুলি কুরআনের আয়াতগুলোর মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের শুরু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে ওহি নাজিলের মাধ্যমে। সূরা আল-আলাক (96:1-5)-এ আল্লাহ নির্দেশ দেন, "পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" এটি ছিল মানবজাতিকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করার প্রথম পদক্ষেপ।

তাঁর দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "মুহাম্মাদ তো একজন রসূল, তার পূর্বেও বহু রসূল এসেছে।" (সূরা আল-ইমরান, 3:144)। তাঁর নবুওয়াত এবং দায়িত্বকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন শেষ নবী: "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন; তিনি আল্লাহর রসূল এবং নবীদের শেষ নবী।" (সূরা আহযাব, 33:40)।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনে যে সব প্রতিকূলতা এসেছে, তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রতি সহানুভূতি এবং সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। যখন তাঁকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তখন আল্লাহ তাঁকে বলেছেন, "তোমার জন্য নিশ্চয়ই এক মহৎ পুরস্কার রয়েছে।" (সূরা আল-আলাক, 96:5)। এছাড়া, সূরা ইনশিরাহ (94:1-6)-এ আল্লাহ তাঁকে বোঝানোর জন্য বলেছেন, "আমরা কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করিনি? তোমার ভার লাঘব করিনি, যা তোমার পিঠ ভেঙে দিচ্ছিল?"

তাঁর নৈতিক চরিত্রের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, "তুমি তো অবশ্যই এক মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা আল-কলম, 68:4)। তিনি ছিলেন করুণা এবং দয়া হিসেবে প্রেরিত, যেমন আল্লাহ বলেন, "আমি তো আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া, 21:107)।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোও কুরআনে এসেছে। সূরা তাওবা (9:40)-এ উল্লেখ রয়েছে, যখন তাঁরা গুহায় লুকিয়ে ছিলেন, আল্লাহ তাঁকে আশ্বাস দেন, "দুঃখ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

তাঁর জীবনের শেষ দিকে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে সূরা আন-নাসর (110:1-3)-এ, যেখানে বলা হয়েছে, "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি দেখবে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে।" এটি ছিল তাঁর মিশনের পূর্ণতা।

তাঁর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ করা মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য। সূরা আহযাব (33:21)-এ বলা হয়েছে, "মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।" এছাড়াও, আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, "তাঁকে মেনে চলো।" (সূরা নিসা, 4:80)।

কুরআনের রেফারেন্সসমূহ:

1. সূরা আল-ইমরান: 3:144
2. সূরা নিসা: 4:69, 4:80
3. সূরা আহযাব: 33:6, 33:21, 33:28-29, 33:40, 33:45-46, 33:56
4. সূরা মুহাম্মাদ: 47:2, 47:33
5. সূরা আল-ফাতহ: 48:2-3, 48:8-10, 48:29
6. সূরা আন-নাজম: 53:2-4
7. সূরা আল-আলাক: 96:1-5
8. সূরা আল-কাসাস: 28:85
9. সূরা আশ-শারহ: 94:1-8
10. সূরা আল-আম্বিয়া: 21:107
11. সূরা আল-হুজুরাত: 49:1-2
12. সূরা আত-তাওবা: 9:40, 9:128-129
13. সূরা আন-নাসর: 110:1-3
14. সূরা আল-কাফিরুন: 109:1-6 (মিশনের প্রেক্ষাপট)